স্বামী সারদানন্দের মানসকন্যা

প্রব্রাজিকা নির্বেদপ্রাণা

ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক সঙ্ঘের ইতিহাসে এই চিঠিটিকে একটি দলিল মনে করা যেতে পারে যেটি ১৯০৯ সালের ৭ অক্টোবর স্বামী সারদানন্দ শ্রীমতী সারা বুলকে লিখেছিলেন, ''নিবেদিতা ও আমি শ্রীমায়ের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, তাঁর ইচ্ছা বেলুড় মঠের মতো মেয়েদের একটি মঠ গড়ে ওঠে।'' আজ একুশ শতকে দাঁড়িয়ে আমরা পিছনে তাকিয়ে দেখছি জগজ্জননী তাঁর ইচ্ছাটিকে বাস্তবায়িত করার সব ব্যবস্থা নিজের হাতেই করে গিয়েছেন। ইতিহাসের এই অনবদ্য অধ্যায়টির রূপকার কে হবেন, কে-ই বা তাঁর শিক্ষার ধারাটিকে আধুনিক যুগের ত্যাগব্রতীদের সামনে তুলে ধরবেন, অর্থাৎ প্রদীপ থেকে প্রদীপ জ্বালাবেন—এসব তাঁরই নির্বাচন। শ্রীশ্রীমা মর্ত্যধাম ছেড়ে যাওয়ার আগে সেবিকা সরলা কাতর প্রার্থনা জানিয়েছিলেন, ''আপনি চলে গেলে আমি আর থাকতে পারব না মা, আমাকে টেনে নিন।'' শ্রীশ্রীমা বলেছিলেন, ''শেষকালে আমার কাছেই তো আসবে মা। তার আগে আমার কিছু কাজ আছে, তা তোমাকে করতে হবে। এখনই চলে গেলে হবে না।'' আজ আমরা বুঝতে পারি শ্রীমা তাঁর শেষ-না-করে-যাওয়া কোন কাজের কথা বলেছিলেন। শুধু বলেননি, তাঁর মর্ত্যবাসের দিনগুলিতে এই 'কোলের মেয়েটি'কে যতটা সম্ভব চোখে চোখে রেখে তাঁকে তৈরিও করে গেছেন; কিন্তু সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত বোধহয় হতে পারেননি। তাই তাঁর 'ভারী' মহাশক্তিমান পুত্রের উপরেও পরবর্তী কিছুটা দায়িত্ব ন্যস্ত করে গিয়েছিলেন। আর ধরিত্রীজননী সারদার সন্তান 'বাসুকি'ও সহস্র ফণা বিস্তার করে সেই তরুণ তরুর চারাটিকে সংসারের তাপপ্রবাহ থেকে রক্ষা করেছেন। তাই 'মরজগতের মলামাটি' সরলার সরল হাসিটিকে মলিন করতে পারেনি। মায়ের মতো অপার স্নেহ, অশেষ উৎকণ্ঠা, অনন্ত অনুপ্রেরণা ও অসীম দায়িত্ব নিয়ে সরলাকে আগলে রেখেছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী সারদানন্দ। বলা যায় মহারাজ যেন তাঁর মানসকন্যাকে ধীরে ধীরে গড়ে তুলেছিলেন ভবিষ্যতের দৈবী কার্যের উদ্দেশ্যে—যদিও মহাকালীর সেই কার্য তখনও মহাকালের গর্ভেই ছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ষদরা বিশ্বাস করেন রামকৃষ্ণ মঠ তাঁরা স্থাপন করেননি। শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুরে অবস্থানকালে স্বয়ং এই মঠ প্রতিষ্ঠা করেছেন। আমাদেরও মনে হয় ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে ফলহারিণী

কালীপূজার রাত্রে শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজেই শ্রীসারদা মঠেরও ভিত প্রতিষ্ঠা করে যান। ১৯০৯ সালে যখন দক্ষিণ ভারতের কোনও ভক্তকন্যা ব্রহ্মচারিণীর জীবনযাপন করার আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বিষয়টি শ্রীমাকে পত্রে জানান, তখন সারদানন্দ মহারাজ শ্রীমায়ের অভিমত জানিয়ে যে উত্তর দেন তাতে অর্থাৎ ওই চিঠিতে ভবিষ্যৎ শ্রীসারদা মঠের সদস্যাদের সঙ্ঘে প্রবেশ সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় নিয়মাবলি বিষয়ে শ্রীশ্রীমা যে চিন্তা করেছেন তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মেয়েদের মঠের ছবি শ্রীমার মানসনেত্রে ছিল, তাই তিনি সর্বদাই মেয়েদের শিক্ষাদীক্ষায় উৎসাহ দিতেন। ব্রাহ্মণকন্যা সরলার নার্সিং শেখার ব্যবস্থাও তিনি সানন্দে অনুমোদন করেছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে শ্রীমায়ের ঘনিষ্ঠ প্রত্যেকের সম্বন্ধেই মায়ের অতন্দ্র সেবক শরৎ মহারাজ অবহিত থাকতেন। শ্রীশ্রীমার সরলাকে তৈরি করার বিশেষ প্রচেষ্টা তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। সেজন্য নিবেদিতা স্কুলের ছাত্রী, নার্সিং ট্রেনিং পাওয়া মায়ের আদরিনি কন্যা সরলা পূজনীয় মহারাজের অপার স্নেহ লাভ করেছিলেন। শ্রীমাও তাঁর মর্ত্যলীলা অবসানের আগে সরলার দেখাশোনা ও ভবিষ্যৎ জীবনের ভার নেওয়ার নির্দেশ দিয়ে যান শরৎ মহারাজকে। সরলার জীবনতরী আক্ষরিক অর্থেই বিভিন্ন ঘাটে ঘুরে অবশেষে মায়ের বাড়িতে নোঙর ফেলেছিল। শরৎ মহারাজ কত আশাই না পোষণ করতেন সরলা নামের ওই ধীরস্থির, অন্তর্মুখী পবিত্র আধারটির উপর!

সরলা তখনও নিবেদিতা স্কুলে আছেন। যোগীন মা, গোলাপ মার দেহত্যাগের পর বিষণ্ণ সরলা একদিন শরৎ মহারাজকে বলেছিলেন, ‘‘আপনি আমাকে রেখে কিছুতেই চলে যেতে পারবেন না, আপনি গেলে কিন্তু আমি কিছুতেই থাকব না।’’ মহারাজ উত্তরে বলেন, ‘‘তোমার জন্য আমারও বড় ভাবনা ছিল, কিন্তু এখন আমি নিশ্চিন্ত হয়েছি।... ঠাকুর, মা তোমার ভার নিয়েই ছিলেন, কিন্তু এখন দেখলাম তাঁরা সম্পূর্ণভাবে নিয়েছেন। আমিও একেবারে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়েছি।... মাকে মানবীরূপে পূজা করেছ, এখন তাঁর স্বরূপ জানবার চেষ্টা কর। মানবজন্ম পেয়েছ, শেয়াল-কুকুরের মতো না মরে এমন মরা মরবে—একটা দাগ রেখে যাবে, ভগবানলাভ করে তারপর যাবে।’’

শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সন্তানের স্নেহধন্যা সরলা ভগবানকেই সম্বল করে গোপনে লোকচক্ষুর অন্তরালে এক উচ্চ অধ্যাত্মজীবনের দিকে যাত্রা শুরু করলেন। শান্ত, মিতভাষী, সেবাব্রতী, পরোপকারী, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর বাৎসল্য তাঁর এই যাত্রাপথকে অভিষ্ণাত করেছিল। তিনি সরলাকে জীবনপথে নির্ভীকভাবে চলতে সবরকমের সাহায্য এবং অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। ভাবলে আশ্চর্য লাগে সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদকের হাজার দায়িত্ব সামলেও কীভাবে দূরদর্শী পিতার মতো সরলার ভবিষ্যতের ভাবনায় অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করেছিলেন। সরলা নার্সিং পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তাঁর সেবার হাতও খুব ভাল ছিল, তাই বহু ভক্ত সেবাশুশ্রূষার জন্য তাঁকে বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইতেন। মহারাজ সরলাকে পাঠাতেন, তাঁদের বলে দিতেন, ‘‘ওকে মঠের মেয়ের মতো দেখবে আর টাকা যা দেবার আমার কাছে দেবে।’’ সেই টাকা জমে সেই আমলে প্রায় সাত হাজারের মতো হয়েছিল। ওই টাকা বেলুড় মঠে রেখে সুদে খাটাবার ব্যবস্থা করেছিলেন শরৎ মহারাজ। তার সুদ হিসাবে মাসে পঁচিশ টাকা করে পাওয়া যেত। সেজন্যই সরলা পরে সাতাশ বছর কাশীতে স্বাধীন জীবন কাটাতে পেরেছিলেন।

সারদানন্দজী সরলাকে ভাল করে ইংরেজি ও সংস্কৃত শেখাতে চেয়েছিলেন। ইংরেজি শেখানোর ভার মহারাজ নিজের হাতে নেন। কিছুটা ইংরেজি

পড়িয়ে তিনি ইংরেজিতে তার সারাংশ লিখতে বলতেন এবং লেখার পর নিজে সেটি শুদ্ধ করে দিতেন। সরলাকে বিদেশে পাঠাবার ইচ্ছাও মহারাজের ছিল। মহারাজের সঙ্গে তাঁকে ইংরেজিতে কথা বলতে হত। ভারতীপ্রাণামাতাজী পরে সারদা মঠে যোগদানকারী অবাঙালি মেয়েদের অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে বলতেন, ''তখন কি জানতাম তোমরা সব আসবে!''

ভগিনী সুধীরা

স্ফুটনোন্মুখ ফুলের কুঁড়িটিকে অভিজ্ঞ মালি যেমন সমস্ত প্রতিকূলতা থেকে সযত্নে রক্ষা করে তেমনই সরলার হৃদয়পদ্মটি ভগবৎপাদপদ্মে নির্বিঘ্নে নিবেদিত না হওয়া পর্যন্ত যেন সারদানন্দ মহারাজের উৎকণ্ঠার অবধি ছিল না। সুধীরাদির দেহত্যাগের পর শরৎ মহারাজ সমব্যথীর মতো সরলার যন্ত্রণার তীব্রতা অনুভব করতে পেরেছিলেন। তাই কদিন পরেই কাশী সেবাশ্রমে যাওয়ার প্রস্তাব এলে মহারাজ অনুমতি দেননি। হৃদয়বান পুরুষ বুঝেছিলেন, এই তীব্র মনঃকষ্টের উপশম শুধু কাজ করে হবে না—সরলার এখন প্রয়োজন নির্জনতা—ধ্যান, প্রার্থনা ও ঈশ্বরনির্ভর একক জীবন। তাই বললেন, ''না, সরলার মন খারাপ, এখন কোথাও যাবে না।''

সুধীরাদির আকস্মিক প্রয়াণের পর স্কুলের দায়িত্ব পড়ে সিস্টারের পুরনো ছাত্রী মহামায়ার উপর। কিছুদিন পর হঠাৎ তাঁর টি বি ধরা পড়ল। অসুস্থ মহামায়াকে দেখতে সরলা তাঁদের কাছে গেলে তাঁর মা জানালেন, একা একা তিনি মেয়েকে নিয়ে থাকেন, সরলা যদি রাতে এসে তাঁদের কাছে থাকেন তো খুব ভাল হয়। সরলা সে-রাত্রি থেকে ওঁদের বাড়িতে শুতে যেতেন। শরৎ মহারাজ তা শুনে বলেন, ''সেবার জন্য যদি ওখানে গিয়ে থাক তো ঠিক আছে, যদি শুধু শোবার লোকের প্রয়োজন হয় তো আমি স্কুলের ঝিকে আট টাকা করে দিলে সে অনায়াসে শোবে, তোমায় শুতে হবে না।'' সরলার শরীর ভাল যাচ্ছিল না এবং তাঁর অতিরিক্ত পরিশ্রমও শরৎ মহারাজকে চিন্তিত করেছিল। তিনি স্নেহব্যাকুল পিতৃহৃদয়ে অসুস্থ, ক্লান্ত কন্যার জন্য একটু অবকাশ খুঁজছিলেন বা একটু বায়ুপরিবর্তন চাইছিলেন। এইসময় স্কুলে গরমের ছুটি পড়ল। কুমিল্লা থেকে প্রফুল্লমুখী দেবী, গিরিবালা দেবী এসেছেন। শরৎ মহারাজ চাইলেন ওঁদের সঙ্গে সরলাকে কুমিল্লা পাঠাতে। যোগীন মা আপত্তি করায় মহারাজ বললেন, ''তুমি কি ওকে বাঁচতে দিতে চাও না? তা যদি চাও, তাহলে ওকে যেতে দাও।'' পিতৃহৃদয়ের আর্তির কাছে যোগীন মার আপত্তি ভেসে গেল। ওখানে গিয়ে কিছুদিনের মধ্যে সত্যি সরলার শরীর বেশ সেরে গেল। এই সময় চিঠিতে শরৎ মহারাজ সরলাকে এখানকার সব খবর বিস্তারিত জানাতেন। এইসব পত্রে মানসকন্যার প্রতি পিতার যে-উদ্বেগ, যে-স্নেহ ফুটে উঠেছে তা পড়ে আমরা অভিভূত হই। সুধীরাদির জন্মদিনের অনুষ্ঠানে বা শ্রীমায়ের জন্মোৎসবের সময় সরলার অনুপস্থিতিতে মহারাজের মনে 'বিশেষ অভাববোধ' জাগে এবং অনুষ্ঠানের ব্যস্ততার মধ্যেও বারবার প্রবাসী মেয়েটির কথা তাঁর মনে পড়ে।

ওই সময় উদ্বোধন থেকে লেখা দু-তিনটি চিঠির কিয়দংশ উল্লেখ করলে পূজনীয় মহারাজের অকৃত্রিম স্নেহের কিছুটা আভাস মিলবে : ''তুমি

আনন্দে আছ এবং যাহাকে ধরিলেই কেবল শান্তি পাওয়া যায় তাহাকে ধরিতে পারিয়াছ তোমার পত্রে ঐ কথা জানিয়া যোগীন মার ও আমার প্রাণে কত আনন্দ হইয়াছে তাহা বলিবার নহে। যোগীন মা বলিলেন—'... আশীর্বাদ করি মার পাদপদ্মে তার মন দিন দিন ডুবে যাক্। আমিও যোগীন মার সহিত তোমাকে ঐ আশীর্বাদ করি।... তোমার অম্বল বাড়িয়াছে জানিয়া পূর্বের ঔষধটি ডাক্তার দুর্গাপদর পরামর্শ অনুসারে অদ্য পাঠাইলাম। দুইবেলা খাবার পরে একচামচ জলের সহিত মিশাইয়া খাইবে।" আর-একটি পত্রে অভিমানী পুত্রীর আবদার পূরণে ব্যস্ত পিতার চিত্র ফুটে উঠেছে : ''তুমি সরলাবালা দাসীর প্রবন্ধটি চাহিয়াছ এবং লিখিয়াছ 'এ জোরটা আমি আপনার কাছে করিতেই পারি।' ঐ জোর কেন মা, তুমি আমার নিকট সকল প্রকার জোরই করিতে পার, সেই অধিকার তোমার আছে ও শ্রীশ্রীমার কৃপায় বরাবরই থাকিবে। কিন্তু কথায় বলে, 'দেশে নাই যা, ছেলে চায় তা'—প্রবন্ধ এবার ছাপা হয় নাই, ঐজন্য তোমাকে পাঠাইতে পারি নাই। যাহা হউক চপলাকে বলিয়াছি সরলাবালার নিকট হইতে উহা চাহিয়া আনিয়া কাহারও দ্বারা লিখাইয়া তোমাদের পাঠাইতে।" আবার কখনও অভিজ্ঞ গুরু যেন উপযুক্ত শিষ্যাকে অধ্যাত্মপথের বাধাবিপত্তি থেকে উত্তরণের পথ বলে দিয়ে অভয় দিচ্ছেন : ''আমার মনে হয় তোমার শরীর এখনও সারে নাই। সেজন্য মনটাও দুর্বল হইয়া রহিয়াছে। তাহার উপর যোগীন মার অসুখের জন্য ভাবনা প্রভৃতি উহাকে আরও দুর্বল করিয়া নানা কথা ভাবায়। যাহা হউক, জপধ্যান করিতে বসিয়া যদি পুনরায় ঐরূপ হয় তাহা হইলে সপ্তাহ কাল একশ আট বার মাত্র জপ (নিয়ম রক্ষার মতো) করিয়া বাকি সময় ধর্মগ্রন্থ যথা—গীতা, কথামৃত, স্তবমালা ইত্যাদি পাঠ করিও। আমার বোধ হয় দু-তিন দিন ঐরূপ করিলেই আবার ধ্যান জপে মন বসিবে। ঐরূপ মনের চঞ্চল অবস্থা, সময়ে সময়ে সকলেরই আসিয়া থাকে। তজ্জন্য ভয় নাই। কিছুদিন বাদেই আবার ঐ অবস্থা চলিয়া যাইবে ও পূর্বের অপেক্ষা অনুরাগের সহিত জপ-ধ্যান করিতে পারিবে। শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা যাহাদের কৃপা করিয়াছেন তাহাদের কোনো ভাবনা নাই জানিবে। তাঁহারা তাহাদের হাত সর্বদা ধরিয়া আছেন, জানিবে।... সতত আমার আশীর্বাদ জানিবে এবং পত্রোত্তরে মনের চঞ্চলভাব চলিয়া গিয়াছে কি না জানাইবে।"

কুমিল্লা থেকে ফেরার সময় মহারাজের পা মোছার জন্য ত্রিপুরার তাঁতে নিজের হাতে একখানি তোয়ালে বুনে নিয়ে আসেন সরলা। আর একবার কিশোরী সরলা তাঁর মায়ের কাছে বায়না করে মহারাজকে রুপোর কাপ-ডিশ দেন চা খেতে। শুধু 'সরলা দিয়েছে' বলেই মহারাজ দু-একদিন তাতে চা খেয়েছেন। রুপোর পাত্রে চা খেয়ে সুখ নেই, বড্ড গরম হয়ে যায়। ত্যাগী সন্ন্যাসী এই শ্রদ্ধার উপহার ফিরিয়ে দিতে পারেননি।

জয়রামবাটীতে মায়ের মন্দির প্রতিষ্ঠা হবে। শরৎ মহারাজ কুমিল্লা থেকে আসবার জন্য সরলাকে লিখে পাঠিয়েছেন। প্রবল ঝড়বৃষ্টি, কোনও যানবাহন নেই, তার মধ্যে কীভাবে শেয়ালদা পৌঁছেছিলেন সে-গল্প পরে ভারতীপ্রাণামাতাজী করতেন। ''সেবারে একটার পর একটা যা ঘটেছিল, নেহাৎ মহারাজের টানের জোরে আমরা নিরাপদে পৌঁছতে পারি।" মহারাজের সঙ্গে জয়রামবাটী যাওয়ার সুখস্মৃতি মাতাজীকে চিরকাল আনন্দ দিত। ''মহারাজের সঙ্গে সাধু ব্রহ্মচারী সবাই মিলে প্রায় পঞ্চাশ জন—সবাইকে নিয়ে রেলের একটা বড় কম্পার্টমেন্ট পুরো ভরে গেল। মহারাজ সকলকে নিজের নিজের বাড়ি থেকে খাবার আনতে বলেছিলেন। তিনি নিয়েছিলেন বালতি করে চিঁড়ে আর দইয়ের হাঁড়ি। স্টেশন থেকে কলা কেনা হল। কলাপাতায় করে চিঁড়ে দই কলা খেয়ে তারপর

সকলের বাড়ি থেকে আনা খাবারও ভাগ করে খাওয়া হল। সে যে কী আনন্দ হয়েছিল কী বলব।”

মহারাজ উৎসবে রোশনাইয়ের জন্য বড় বড় হ্যাজাক কিনেছিলেন। যাঁরা পারবেন না তাঁদের সকলের গাড়িভাড়া মহারাজই দেন। বাঁকুড়া থেকে আসা মোটরগাড়ি স্টার্ট না নেওয়ায় মহারাজকে গরুর গাড়িতেই কোয়ালপাড়া যেতে হয়েছিল। এ নিয়ে খুব মজা করে সবাই মহারাজকে বলতে লাগল, ‘‘আপনার মোটরগাড়ি কোথায় গেল?” মহারাজ হেসে বললেন, ‘‘মা এ পথে কোনদিন মোটরে চড়েননি আর তাঁর দারোয়ান কিনা মোটরে চড়ে আসবে! তাই তো মা মোটর খারাপ করে দিলেন।” উৎসবের দিন খুব ‘দীয়তাং ভুজ্যতাং’ চলল। সেবারে মহারাজ কাউকে ফেরাননি। সকালে মন্ত্রদীক্ষা দিতে আরম্ভ করে বিকেল পাঁচটার পর ওঠেন। অনেককে সন্ন্যাস-ব্রহ্মচর্যও দিয়েছিলেন। এই আনন্দের রেশ নিয়ে সরলা কুমিল্লা ফিরে যান। অল্প কিছুদিন বাদেই যোগীন মার সেবার জন্য শরৎ মহারাজ তাঁকে আবার ডেকে পাঠালেন।

প্রায় একবছর উদ্বোধনে আছেন সরলা। এর মধ্যে একদিন যোগীন মা মহারাজকে বললেন, ‘‘সরলাকে সন্ন্যাসটা দিয়ে দাও না।” মহারাজ হেসে বললেন, ‘‘সন্ন্যাস বললেই হল আর কি! জানো, সন্ন্যাসের পর গিনি দিয়ে গুরুদক্ষিণা দিতে হয়।” যোগীন মাও উত্তর দিলেন, ‘‘আচ্ছা আমি তাই দেওয়াব।” মহারাজ তখন সরলাকে ডেকে বললেন, ‘‘তোমার খুব ভাগ্যি ভাল, যোগীন মা নিজে থেকে সন্ন্যাসের কথা বললেন। আমার একটা ইচ্ছা ছিল, তবে জানাজানি হবে মনে করে ভেবেছিলুম মন্ত্রগুলি এমনি পড়িয়ে দেব। উনি যখন বলছেন তখন আর কোনও গোল রইল না। কাল সারাদিন উপোস করে থেকো।”

সন্ন্যাসগুরুকে স্নেহময় পিতার রূপেই প্রত্যক্ষ করলেন সরলা। শরৎ মহারাজ নিজে কপিল মহারাজকে দিয়ে হোমের সব ব্যবস্থা করেন এবং হরিপ্রেম মহারাজকে ডেকে রাতটুকু অসুস্থ যোগীন মার কাছে থাকার ব্যবস্থা করেন। সন্ন্যাসদীক্ষার পর মহারাজ সরলার নাম দিলেন ‘শ্রীভারতী’। প্রথমে নাম দিয়েছিলেন ‘সারদা’, কিন্তু যোগীন মা আপত্তি করেন এই বলে যে, মায়ের নাম ধরে তাঁরা কী করে ডাকবেন! তখন মহারাজ নাম বদলে দেন। যোগীন মা সত্যিই সরলার হাতে গিনি দিয়ে শরৎ মহারাজকে প্রণাম করিয়েছিলেন। মহারাজ তাঁকে নিজের ব্যবহার করা গেরুয়া চাদর দিয়ে বলেছিলেন, ‘‘রেখে দাও। সময়মতো পরবে।”

পরের বছর শরৎ মহারাজের সঙ্গে কাশী গিয়ে সরলা খুবই আনন্দ পান। শিবরাত্রির দিন আর রংভরী একাদশীর দিন মহারাজের সঙ্গে এক গাড়িতে বাঁশফটক দিয়ে বিশ্বনাথ দর্শন, সারনাথে মহারাজকে নিয়ে চড়ুইভাতি—এসবই সরলার

জীবনের বিশেষ ঘটনা। মহারাজ সরলাকে পুরীধামও দর্শন করান। ওখানে একটি কথা প্রচলিত, ''চাঁদি দিয়ে চাঁদমুখ দেখবে।'' মহারাজ তাই একদিন সরলার হাতে একটি মোহর দিয়ে জগন্নাথ দর্শন করতে পাঠান।

পরবর্তী কালে ভারতীপ্রাণামাতাজী সেইসব পুরনো দিনের কথা উল্লেখ করে বলতেন, ''কী ভালবাসাই যে মহারাজের কাছে পেয়েছিলুম!'' একদিন মাতাজীর এক শিষ্যা জিজ্ঞাসা করেন, ''আপনি সবচেয়ে আনন্দে কখন ছিলেন?'' মাতাজী বলেন, ''শ্রীশ্রীমায়ের কাছে যখন ছিলাম তখনই সবচেয়ে আনন্দে ছিলাম। তারপরে আনন্দে ছিলাম যখন শরৎ মহারাজ ছিলেন।''

একদিন সরলা শরৎ মহারাজকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ''আপনি মাকে এখনও দেখতে পান?'' মহারাজ উত্তর দেন, ''তা না হলে এখানে পড়ে আছি কি করে?''

সরলা যখন শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে কোয়ালপাড়ায় ছিলেন, মা তাঁকে সোনার হার গড়িয়ে দিতে চান। কিন্তু সেখানে আরও মেয়েরা আছেন তাই মা বললেন, ''এখানে সকলে রয়েছে, তাই তোমাকে হার গড়িয়ে দিতে পারলাম না। তুমি কলকাতা গিয়ে শরৎকে দিয়ে করিয়ে নিয়ো।'' এই বলে সরলার হাতে একশো টাকা দেন। একথা সরলা সুধীরাদিকে জানালে তিনি বলেন, ''হার তো তুমি পরছ না, ওই টাকা স্কুলে থাক—স্কুলের কাজে লাগবে।'' পরে যখন সরলা শরৎ মহারাজকে পুরো ব্যাপার জানান তখন মহারাজ বলেন, ''এটা তুমি ঠিক করোনি। খুব অন্যায় করেছ। যাকগে যা হওয়ার হয়েছে। এখন তুমি মাকে চিঠি লিখে দাও যে তুমি এই করেছ।''

শরৎ মহারাজের সর্বদা একটাই লক্ষ্য, সরলার অধ্যাত্মজীবন যাতে সঠিকভাবে গড়ে ওঠে। এজন্য তাঁর চেষ্টার অন্ত ছিল না। মাঝে মাঝেই সরলাকে তিনি রাজা মহারাজের কাছে পাঠাতেন, মহারাজের অমূল্য উপদেশ যাতে সরলার পাথেয় হয়। তিনি নিজেও উৎসাহ দিয়ে বলতেন, ''খুব জোর টর্চের আলো ফেললে যেমন জ্বলজ্বলে ভাব দেখা যায়, সেইভাবে চিন্তা করতে করতে ইষ্টের জ্যোতির্ময় রূপের আভাস পাওয়া যায়।''

ভারতীপ্রাণামাতাজী বলতেন, যোগীন মা, গোলাপ মা কখনও কখনও তাঁর ওপর রাগ করলেও শরৎ মহারাজকে তিনি কোনওদিন রাগ করতে দেখেননি। বরং কাছে ডেকে বুঝিয়ে বলাটাই মহারাজের বৈশিষ্ট্য ছিল। শেষ অসুখের সময় শ্রীশ্রীমা কিছুই খেতে পারতেন না। একদিন মাকে দেওয়া ভাতের পরিমাণ দেখে ডাক্তার কাঞ্জিলাল বিরক্ত হয়ে সরলাকে বলেন, ''তুমি কি মাকে মেরে ফেলবে? এই রোগা শরীরে এত ভাত খেতে দিচ্ছ? এ আর চলবে না। নার্সের ব্যবস্থা করতে হবে দেখছি।'' ডাক্তারের কথা শুনে সরলা মনে খুব ব্যথা পেলেন। শ্রীমার সেবা ছেড়ে স্কুলে চলে যাবেন স্থির করে শরৎ মহারাজকে বলতে গেছেন, গোলাপ মা শুনতে পেয়ে বলতে লাগলেন, ''যেতে চায় যাক না, কার মাথা কিনে নিয়েছে? নিজের গুরুর সেবা করছে, নিজেরই মঙ্গল হচ্ছে, তাতে অত মেজাজ দেখানো কেন? ডাক্তার একটা কথা বললেই বা।'' শরৎ মহারাজও বললেন, কিন্তু সে-বলা যেন অভিমানী মেয়েকে বাবার সান্ত্বনা— ''...ভেবে দেখো, ঠাকুরকে অসুস্থ দেখেও যোগীন মা চলে গেলেন, তাই শেষ সময়টা আর দেখা হল না। তুমি কি এই সময়টা চলে যাবে?'' সরলা মহারাজের ইঙ্গিত ধরতে পেরে মন থেকে সব অভিমান ঝেড়ে ফেলে থেকে গেলেন।

গোলাপ মার দেহত্যাগ হল মার জন্মোৎসবের পরদিন। আগের রাত থেকেই তাঁর তীব্র কষ্ট শুরু হয়েছে, সঙ্গে খিঁচুনি। সরলা একা। উৎসব শেষে সবাই ফিরে গেছেন। কোনওমতে দুহাতে গোলাপ মাকে ধরে রেখেছেন সরলা। সারাদিন মায়ের

উৎসবের খাটুনি গেছে—কোমর, পিঠ সব যন্ত্রণায় ফেটে যাচ্ছে। আর যেন পারছেন না। মহারাজের শরীরও ভাল নয়। সারাদিন পরিশ্রমের পর তিনিও একটু ঘরে গেছেন। কিন্তু রাত বারোটার সময় মহারাজ এসে গোলাপ মার ঘরে তাঁর কাছে বসলেন, সরলাকে একটু বিশ্রাম নিতে পাঠালেন। এই ঘটনাটি সরলার মনে খুব দাগ কেটেছিল। এভাবে সবকিছুর মধ্যে তিনি শরৎ মহারাজের পিতৃহৃদয়ের স্পর্শ অনুভব করতেন।

একবার সরলা কামাখ্যা যাচ্ছেন, স্টেশনে পৌঁছে মনে পড়েছে জপের মালাটি আনেননি। শ্রীশ্রীমার দেওয়া মালা। গগন মহারাজ সঙ্গে যাচ্ছিলেন, শুনে বললেন, তিনি ফিরে গিয়ে মালাটি কুমিল্লায় পাঠিয়ে দেবেন কারণ সরলা কামাখ্যা থেকে সোজা কুমিল্লায় চলে যাবেন। বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করে মালা না পেয়ে সরলা শরৎ মহারাজকে ব্যাপারটা জানান। মহারাজ খোঁজ নিয়ে জানেন যে মালাটি গগন মহারাজ রেজিস্ট্রি ডাকে না পাঠিয়ে এমনি পার্সেল করে পাঠিয়েছিলেন, তাই নাও পাওয়া যেতে পারে। এরপর সরলা উদ্বোধনে এলে মহারাজ তাঁকে বললেন, ''আমার কাছে মার গলার মালা আছে। ইচ্ছা করলে নিতে পারো, আর না হলে তোমাকে নতুন মালাও দিতে পারি।'' মহারাজ মার গলার মালাটিই দিয়েছিলেন। এভাবে মহারাজের অশেষ স্নেহ যেন একাধারে মা এবং বাবার মতো সরলাকে আগলে রেখেছিল। বিশেষ করে শ্রীশ্রীমা, যোগীন মা, গোলাপ মা সকলের দেহত্যাগের পর সরলার শরীর ও মন দুই-ই ভেঙে পড়ে। মহারাজ সেইসময় তাঁকে নিয়ে কাশী, পুরী ইত্যাদি তীর্থে তীর্থে গেছেন, তাঁর স্বাস্থ্যের খবর নিয়েছেন, খাওয়া-দাওয়া এবং খুঁটিনাটি সব বন্দোবস্ত করেছেন। ঠিক যেমন সদ্যমাতৃহীন শিশুকে স্নেহশীল পিতা সযত্নে রক্ষা করে থাকেন।

যোগীন মা, গোলাপ মা চলে যাওয়ার পর সরলা আর উদ্বোধনে রাত্রিবাস করেননি। মন বড় খারাপ—কিছুই ভাল লাগে না। শুধু শরৎ মহারাজের কাছে এলে আনন্দ পেতেন, শান্তি পেতেন তাই সময় পেলেই স্কুল থেকে উদ্বোধনে চলে আসতেন। সকালে গঙ্গাস্নান করে মায়ের বাড়ি গিয়ে যখন মাকে প্রণাম করতেন তখন মহারাজ জপ করতেন। সরলা পাশে গিয়ে চুপটি করে বসে থাকতেন। একটু পরে মহারাজ জপ থেকে উঠে চা-জলখাবার খেতেন, সরলাকেও খেতে বলতেন। কিন্তু তখন তো স্কুলে ফিরে ভাত খেতে হবে, সরলা তাই খেতেন না। বিকেলে স্কুলের পর আবার যেতেন। মহারাজ সরলার জন্য প্রসাদ রেখে দিতেন—যা যা দুপুরে নিজে খেতেন সবই থাকত। মহারাজ নিজে তখন চা-বিস্কুট খেতেন আর সরলা ওই প্রসাদ খেতেন। একেবারে আরতি দেখে স্কুলে ফিরতেন। ভারতীপ্রাণামাতাজী পরে স্মৃতিচারণ করেছেন, ''মহারাজ ডাকতেন, 'হরিপ্রেম, হরিপ্রেম' বলে। হরিপ্রেম মহারাজ রোজ আমাকে পৌঁছে দিয়ে আসতেন একেবারে স্কুলের দোরগোড়া পর্যন্ত। তখন অনেকে বলত—ওই এল মহারাজের মানসকন্যা, আদরিনি নন্দিনী।''

মাতাজী আরও বলতেন, ''মহারাজের কাছে আমি সত্যি খুব আবদার করতাম। যা করবার ওঁর কাছেই করেছি। স্নেহ করতেন খুব। তাই আমি বলেছিলাম—শেষে না আপনার জড়ভরতের মতো অবস্থা হয়। মহারাজ বলেছিলেন—তাই নাকি? একটু হেসেছিলেন। পরে একদিন মঠে গিয়েছিলেন, কী মনে হয়েছে, ঠাকুরকে একথাটা বলেছেন যে—ও যা বলছে তা কি ঠিক? ঠাকুর বলেছেন—না ঠিক নয়। ওর মধ্যে আমাকে দেখিস তাই ওকে এত ভালবাসিস, স্নেহ করিস। ওতে কিছু হবে না। শরৎ মহারাজ ফিরে এসে আমাকে বলেছিলেন—তুমি যা বলেছ তা ঠিক নয়। ঠাকুর আজ আমায় দেখিয়ে দিয়েছেন।''

স্নেহের সরলা একদিন মহারাজকে জিগ্যেস করেছিলেন, ''আপনার দীক্ষা দিতে এত দেরি হয় কেন? মার তো দেখেছি অত দেরি হত না।'' খানিক চুপ করে থেকে তিনি উত্তর দিলেন, ''মা কাকেও ছুঁয়ে দিলেই তার সব হয়ে যেত, কিন্তু আমি তা পারি না। আমাকে অনেক আহ্বান করতে হয়। তিনি গ্রহণ করলেন বা ভার নিলেন যতক্ষণ না দেখতে পাই ততক্ষণ আমার ছুটি নাই।''

আর এক দীক্ষার দিন বিকেলবেলা সরলা দেখেন মহারাজ চুপচাপ বসে আছেন। জপধ্যানও করছেন না। কারণ জিজ্ঞেস করায় বললেন, ''আজ একজনকে দীক্ষা দেওয়ার পর থেকেই দেখি শরীরটা অসোয়াস্তি বোধ করছে, একটা জ্বালাপোড়ার মতো বোধ হচ্ছে।'' সরলা শুনেছিলেন মহারাজ একজনকে বলছেন, ''আমি তোমার ইহজন্মের ও পূর্ব পূর্ব জন্মের পাপপুণ্যের ভার নিলাম।''

শরৎ মহারাজের কাছে ঠাকুরের অনেক কথা শুনেছিলেন সরলা। মহারাজ একবার দেখেছিলেন ঠাকুর ভাবে নৃত্য করছেন; ঠাকুরের শরীর যতটা লম্বা তার চেয়ে অনেক বেশি দীর্ঘ আর একেবারে লঘুভার হয়ে গিয়েছে।

সরলা একদিন অলৌকিকভাবে শরৎ মহারাজকে শ্রীশ্রীমা-রূপে দেখে ভয় পেয়ে যোগীন মাকে সেকথা জানান। যোগীন মা বলেন, ''এতে অলৌকিক কিছু নেই। শরৎ মহারাজের মধ্যে শ্রীমাই বাস করছেন।''

শরৎ মহারাজ অসুস্থ হয়ে পড়ার দিন থেকে শেষদিন পর্যন্ত সরলা তাঁর কাছেই ছিলেন। যেদিন রাতে মহারাজের স্ট্রোক হল সেদিন দুপুরেও মহারাজের নির্দেশে সরলা উদ্বোধনে মায়ের বাড়িতে প্রসাদ নিয়েছেন। তারপর সারাদিন বিভিন্ন কাজকর্মের পর সন্ধ্যাবেলা মহারাজ নিজের হাতে শেষবারের মতো তাঁকে প্রসাদ দিলেন। খাটে বসতে গিয়ে মহারাজ আর বসতে পারছেন না, পড়ে যাচ্ছেন দেখে সরলা বলে উঠলেন, ''এ কী আপনি ওরকম হয়ে যাচ্ছেন কেন?''—বলে মহারাজকে বিছানায় শুয়ে পড়তে সাহায্য করলেন। তখনও মহারাজ হাত দিয়ে ইশারা করে সরলাকে বলছেন, ''গোল করো না, খেয়ে নাও।'' এর তেরো দিন পরেই তো সব শেষ—মহারাজ চলে গেলেন। এইসময় সরলাকে মহারাজের খাটের পাশে বসে ফিডিং কাপে তাঁকে খাওয়াতে দেখে বিশুদ্ধানন্দ মহারাজ জানতে চেয়েছিলেন, কে এই ভাগ্যবতী মেয়েটি?

শরৎ মহারাজের শরীরত্যাগের দিন মহাপুরুষ মহারাজ তন্দ্রার মধ্যে শুনতে পেলেন, শরৎ মহারাজ তাঁকে বলছেন, ''এরা সব রইল। আমি কাশীতে বাবা বিশ্বনাথের কাছে চললুম।'' ওই কথা শোনার পর সরলার মনে হল—তাহলে তো মহারাজ কাশীতেই গেছেন, আমাকে তো সঙ্গে নিয়ে যাবেন বলেছিলেন! মানসিকভাবে বিধ্বস্ত কন্যার মনে হল—আমিও তাহলে কাশী যাব। তিনি কাশী যাওয়ার সংকল্প স্থির করে ফেললেন। শরৎ মহারাজ কাশী সেবাশ্রমে থাকতে বারণ করেছিলেন, সেই নির্দেশ মেনে আলাদা বাড়ি করে কাশীতে থাকতে লাগলেন।

ভারতীপ্রাণামাতাজীর পরবর্তী জীবনের দিকে তাকালে আমরা তাঁর জীবনের সঙ্গে সারদানন্দ মহারাজের জীবনের আশ্চর্যরকম সাদৃশ্য খুঁজে পাই। শাস্ত্রোক্ত স্থিতপ্রজ্ঞত্ব যেন সারদানন্দজীর জীবনে রূপ পরিগ্রহ করেছিল। নিখিলানন্দজী লিখেছেন, ''নিজেকে সাক্ষি স্বরূপ ও উদাসীন করে কীভাবে অনাসক্ত হয়ে সমস্ত কাজ সম্পন্ন করতে হয় তা সারদানন্দ মহারাজের কাজকর্মের মধ্যে লক্ষ করা যেত। তিনি ঠাকুর ও মায়ের ভারী হয়ে জীবন কাটালেন, শরীর, মন, প্রাণ দিয়ে নবপ্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের দায়িত্ব সামলিয়ে জনম সফল

করলেন।'' ঠিক সেই একইভাবে তাঁর মানসকন্যাও নবপ্রতিষ্ঠিত মায়ের সঙ্ঘকে 'ভালবাসা ও ক্ষমা, স্থৈর্য ও ধৈর্য, অনুকম্পা ও আধ্যাত্মিকতা' দিয়ে চালিত করে গেছেন। তাঁর চরিত্রের সরলতা, মাধুর্য, নিরভিমানিতা, সুখে-দুঃখে সমত্ব, সেবাভাব—সারদানন্দজীকেই মনে করিয়ে দেয়। পিতার সম্পত্তিতে সন্তানের অধিকার স্বতঃই থাকে। শরৎ মহারাজের চরিত্রের অসাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলিও তেমনি তাঁর মানসকন্যার মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। স্বামী সন্তোষানন্দ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদকের অফিসের অপূর্ব বর্ণনা দিয়েছেন : ''সেই চেয়ার-টেবিল হীন, বিদ্যুতের আলোবাতাস শূন্য একটি ছোট ঘরে বসে সংযমী পুরুষ সারদানন্দ ঠাকুরের কাজ করে চলেছেন নীরবে।'' এই প্রেক্ষিতে আমাদের মনে মাতাজীর তিনতলার ছাদের ওপর ছোট ঘরটির ছবি ভেসে ওঠে। ঘরটির পূর্ব-পশ্চিমে দুটি জানালা এবং উত্তর-দক্ষিণে দুটি দরজা। একটি চৌকির ওপর তাঁর বিছানা। এরপর আর ঘরে হাঁটা-চলার পরিসর নেই। এককোণে ট্রাঙ্ক। দেওয়ালের তাকে তাঁর কাশীবাসকালে বহুদিন পূজিত ঠাকুর-মায়ের প্রতিকৃতি। ওই ঘরে এতগুলি বছর বাস করে গেলেন নির্বিকার চিত্তে। তাঁকে দেখে কখনও মনে হয়নি জগতের কারও বিরুদ্ধে তাঁর কোনও অনুযোগ আছে। ঘরের ছাদ নিচু হওয়ায় গ্রীষ্মের দুপুরে খুব গরম হত। পরে একটি ছোট সিলিং ফ্যানের ব্যবস্থা করা হলেও তিনি নিজের জন্য সেটি ব্যবহার করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। শ্রীমা জুতো, ছাতা ব্যবহার করেননি বলে তিনিও কোনওদিন সেসব ব্যবহার করলেন না।

সারদানন্দজীর অসাধারণ শান্তভাব সম্পর্কে বীরেন মহারাজ একটি ঘটনা বলতেন। শ্রীমা তখন স্থূলদেহে নেই। মহারাজ আছেন মায়ের বাড়িতে তাঁর দোতলার ঘরে। মন্দিরে অর্থাৎ মায়ের ঘরে সন্ধ্যারতি চলছে। নিচের তলার ঘরে প্রবেশপথের ডানপাশে দুজন ঝগড়া করছে—এমনকী হাতাহাতিও চলছে। আর মায়ের ঘরের ওপরে তিনতলার বঁদিকের কোণের ঘরে এক প্রবীণ সাধু ভাঙা গলায় হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গাইছেন। সে এক নৈরাজ্যের পরিস্থিতি। সারদানন্দজীকে বলা হল, ''আপনি কি কিছুই শুনতে পাচ্ছেন না?'' মহারাজ অবাক চোখে বললেন, ''কেন কী হয়েছে?'' কিছুই তাঁর কানে যায়নি। সব শুনে বললেন, ''তোমরা ওসব শোন কেন?'' কেমন স্থিতধী তিনি! ইংল্যান্ড যাচ্ছেন জাহাজে। ঝড় উঠল ভূমধ্যসাগরে। জাহাজ এই ডোবে তো সেই ডোবে। সমস্ত জাহাজে কান্নাকাটি পড়ে গেছে। শরৎ মহারাজ কিন্তু স্থির। বেলুড় মঠে যাচ্ছেন—গঙ্গায় ভীষণ ঝড় উঠেছে, মহারাজ নিশ্চিন্তে তামাক খাচ্ছেন। আবার মাধুকরী করতে গিয়ে গালাগালিও অক্লেশে হজম করেছেন। খাওয়া-পরার কষ্ট তো প্রথম থেকেই ছিল—তেলাকুচা পাতার চচ্চড়ি আর ভাত, শীত তাড়াবার জন্য উদ্দাম নৃত্যকীর্তন—এসবের কোনওটাই মহারাজকে বিচলিত করতে পারেনি।

ভারতীপ্রাণামাতাজীও সেই সতেরো বছর বয়সে বাড়ি থেকে পালিয়ে আসা অবধি কী কষ্টই করেছেন। আজ এখানে তো কাল ওখানে—লুকিয়ে থাকা, ধরা পড়ে গেলে বাড়িতে ফিরে যাওয়ার ভয়, লাঞ্ছনা, অপমান, পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দেওয়ার শাসানি, বাক্স-প্যাঁটরা নিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ানো। পেটভরা খাবার যে কতদিন জোটেনি! এমন সব বৈচিত্র্যময় অসহনীয় কষ্ট আমরা কল্পনা করতেও ভয় পাই। কাশীতেও প্রথম প্রথম কী কষ্টই করেছেন। অর্থ ছিল না, কত হিসেব করেই না চলতে হত! একবার তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, ''এত কষ্ট আপনি কী করে সইতে পারলেন?'' মাতাজী হাসতেন, বলতেন, ''মনে খুব জোর আসত—যাঁর জন্য বাড়ি ছেড়ে বেরুনো, তা যেন সিদ্ধ হয়—সেই চিন্তাটাই আমায় সবসময় ধরে এগিয়ে নিয়ে যেত।''

পরবর্তী কালে নতুন রাজ্যে, সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবেশে তাঁকে যেতে হয়েছে কতবার। সর্বাবস্থায় তিনি শান্ত, স্বস্থ। রামেশ্বরে সারদা মঠের অধ্যক্ষা হিসাবে 'টেম্পল অনার' নেওয়ার সময়ও যেমন নির্বিকার, হোটেলের অপরিচ্ছন্ন জায়গায় আহার গ্রহণের সময়ও ঠিক একইরকম অচঞ্চল। যেকোনও পরিবেশে হাজার অসুবিধার মধ্যেও তিনি অবিচলিত থেকে শান্তভাবে মানিয়ে নিতেন এবং সংস্কারমুক্ত উদার মন নিয়ে খুঁটিনাটি বাছবিচারগুলিকে গুরুত্ব না দিয়ে একটি যুক্তিপূর্ণ সহজ মীমাংসায় পৌঁছে যেতে পারতেন। আধুনিক মেয়েরা পর্যন্ত তাঁর আচরণ দেখে অবাক হয়ে যেতেন।

সারদানন্দ মহারাজ বেশি বকাবকি করতেন না কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বে এমন একটি অভিজাত গাম্ভীর্য ছিল যে অনেক অশান্ত ব্যক্তির দৌরাত্ম্য তাঁর উপস্থিতিতেই বন্ধ হয়ে যেত। মহারাজের অভিধানে কঠোরতম শব্দটি ছিল 'বাঁদর'। ওই পর্যন্তই। সেখানেই রাগ, ধমক সব শেষ। একদিন শরৎ মহারাজ ব্রহ্মচারী গণেনকে বললেন, ''ওরে গণেন, accounts একবার দেখাস তো।'' গণেন কড়া সুরে উত্তর দিলেন, ''আপনি accounts-এর কী বোঝেন যে accounts দেখতে চাইছেন?'' মহারাজ শুধু বললেন, ''ওরে অত ভাল না।'' এখানেই পরিসমাপ্তি। ভারতীপ্রাণামাতাজীকেও বকাবকি বা রাগপ্রকাশ করতে কেউ দেখেনি। তাঁর রাগ খুব অল্পেই মিলিয়ে যেত। তাঁর রাগের প্রকাশ খুব গম্ভীর হয়ে যাওয়া। তখন কাছে যায় কার সাধ্য! একদিন সন্ধ্যায় যথাসময়ে শাঁখ বাজানো হয়নি। মাতাজী সেদিন নিজের ঘর থেকে আরতিতে আর আসছেন না। খুব অসন্তুষ্ট, গম্ভীর হয়ে বসে আছেন। ঋতপ্রাণাজী একদিন মার কথা অমান্য করে [মঠবাসিনীরা ভারতীপ্রাণামাতাজীকে মা বলতেন] গঙ্গাস্নান করেননি, গঙ্গার ঘাট থেকে জল অনেক দূরে—কাদার ভেতর দিয়ে হাঁটতে হবে সেই ভয়ে। জানতে পেরে মা খুব গম্ভীরভাবে বললেন, ''গঙ্গাস্নান না করলে আমি আর কখনও তোমার সঙ্গে কথা বলব না।'' এরপর তিনি গঙ্গাস্নান সেরে যখন মায়ের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন, মা তখন একমুখ হেসে বললেন, ''এসব দিনে গঙ্গাস্নান করলে অনেক জন্মের তপস্যার ফল লাভ হয়।'' এমনই শান্ত, সংযত ছিল মায়ের জীবন।

স্বামী তুরীয়ানন্দজী, অতুলানন্দকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, ''যথার্থ সাধুর একটি লক্ষণ হল—যেকোনও ব্যক্তিরই কথা মন দিয়ে শোনা—ধৈর্য ধরে, অপ্রয়োজনীয় বোধে তুচ্ছতাচ্ছিল্য না করে।'' শরৎ মহারাজের এই বিশেষ গুণটি ছিল। মহিলারা তাঁদের নানা গভীর এবং জটিল সমস্যার কথা অকপটে নিবেদন করতেন সারদানন্দজীর কাছে। তিনি অসীম ধৈর্য নিয়ে শুনতেন, প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতেন। শ্রীশ্রীমার অবর্তমানে তিনিই 'মা' হয়ে উঠেছিলেন। ভারতীপ্রাণামাতাজীর ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়। তিনি সকলের সংসারের সুখ-দুঃখ, নানা যাতনার কথা মন দিয়ে শুনতেন। নিজের আহার-বিশ্রামের কথা তাঁর মনে থাকত না। সেবিষয়ে সেবিকা অনুযোগ করলে বলতেন, ''সংসারের জ্বালায় অস্থির হয়ে আসে, দুটো কথা বলে শান্তি পায়। কখনও ওদের বাধা দেবে না, আমার প্রসাদ পেতে একদিন দেরি হওয়া বড় কিছু নয়।'' এমন প্রায়ই ঘটত। কত আর্তকে সান্ত্বনা দিয়েছেন, কত দিশেহারাকে দিশা ঠিক করে দিয়েছেন, কত মানুষের চোখের জল মুছে দিয়ে তাদের মুখে হাসি ফুটিয়েছেন। প্রসঙ্গত, স্বামী ভূমানন্দ লিখেছেন, ''কোনদিনই শরৎ মহারাজ বেলা দেড়টার আগে খাইতেন না। নিত্য সকলের সঙ্গে বসিয়া খাওয়া তাঁহার ঘটিত না।''

আশ্চর্য স্বাবলম্বী জীবনযাত্রা ছিল শরৎ মহারাজের। কত গুরুত্বপূর্ণ কাজ তাঁর কাঁধে, তা তাঁর অনাড়ম্বর জীবনচর্যা দেখে বোঝার উপায় ছিল না।

সর্বদাই নিজের কাজ নিজে করার পক্ষপাতী। পরিণত বয়সেও সকাল-সন্ধ্যায় নিজের কাপড়-গামছা নিজেই কাচতেন। দুপুরে বা রাতে কখনই নিজের জন্য কোনওরকম আলাদা আয়োজন বরদাস্ত করতেন না। নিজেকে মায়ের দ্বারী বা ভারী ছাড়া কিছু ভাবতে পারতেন না। গভর্নর না জেনে জুতো পরে ঠাকুরঘরে ঢুকতে যাচ্ছেন, শরৎ মহারাজ হাঁটু গেড়ে তাঁর জুতোর ফিতে খুলে দিচ্ছেন। এত নিরভিমান। নিখুঁত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নিয়মানুবর্তী জীবন। প্রত্যেক জিনিসটি যথাস্থানে রাখা, তিলমাত্র এলোমেলো নয় কোথাও। ভারতীপ্রাণামাতাজীও প্রথম থেকেই স্বাবলম্বী। কতটা স্বাবলম্বী হলে সতেরো বছর বয়সে ভগবানকে অবলম্বন করে একটি মেয়ে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারেন! তাঁর এক সঙ্গী উষারানি দেবী যখন প্রথম কাশীতে আসেন, প্রিয় মহারাজ একটা বাড়ি ঠিক করে হরিপ্রেম মহারাজকে একটু আধটু সাহায্য করতে বলেছিলেন। উষাদেবী বলেন, ''সরলাদি তখন আমাকে ধমক দিয়ে বলেছিলেন—কেন সাধু করবে? নিজেরটা নিজে করে নিতে পারবে না?'' মাতাজীর দৈনন্দিন জীবন ছিল অতিরিক্ত সাধারণ। নিজের কাজ নিজেই করে নিতেন। সব ছোট কাজে নিষ্ঠা ছিল দেখার মতো! নিজের ব্যবহারের গামছাখানি কী পরিপাটি করে কাচতেন, মেলতেন। খবরের কাগজ নিখুঁত করে ভাঁজ করতেন। ফুলের বাগানে জল দিতেন যেন সকলের একজন, বিশেষ কেউ নন। চোখে কম দেখতেন তাই চিঠিপত্র লিখে দিতেন অমৃতপ্রাণাজী। তিনি প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে গিয়ে দেখতেন, চিঠি লেখার সরঞ্জাম নিয়ে মা তৈরি হয়ে বসে আছেন। যেসব চিঠিপত্র আসত সেগুলি তিনি নিজে তারিখ অনুযায়ী ভাগ করে বেঁধে রাখতেন।

কাশীবাসকালীন সরলা দেবী

ছোটখাট ব্যবহারেও তাঁর মহত্ত্ব ও নিরভিমানিতা প্রকাশ পেত। ছোটকেও কত মান দিতেন। শ্যামাপ্রাণাজীর পূর্বাশ্রমের নাম ছিল সরলা। তিনি যখন নবাগতা, একদিন ভারতীপ্রাণামাতাজী একটি চিঠি হাতে তাঁর তিনতলার ঘর থেকে নেমে এসেছেন তাঁর কাছে। বলছেন বিনীতভাবে, ''দেখো গো আমি বড় ভুল করে ফেলেছি। তোমার নামও সরলা। আমি আমার ভেবে চিঠি তো ছিঁড়ে ফেলেছি।'' আর খুলে যেই দেখেছেন অন্য ভাষা, সঙ্গে সঙ্গে মঠের অধ্যক্ষা ভুল স্বীকার করে নবাগতার হাতে সেই চিঠি নিজে পৌঁছে দিতে নেমে এসেছেন। মনে পড়ে যায় শরৎ মহারাজের কথা। বৃন্দাবন কেন্দ্রের কর্মী স্বামী উমানন্দ বেলুড় মঠে চলে এসেছেন। শরৎ মহারাজ তাঁকে খুব বকলেন, অনুমতি না নিয়ে তিনি চলে এসেছেন ভেবে। পরে যখন অন্যান্য কাগজপত্রের মধ্যে উমানন্দের আগেই পাঠানো চিঠিটি পাওয়া গেল তখন মহারাজ শিষ্যস্থানীয় উমানন্দের কাছে শুধু যে ক্ষমা চাইলেন তাই নয়, ভাবলেন সাধারণ সম্পাদক পদের মর্যাদা তিনি রাখতে পারেননি। বিষয়টি সঙ্ঘাধ্যক্ষ ব্রহ্মানন্দ মহারাজকে জানিয়ে শাস্তি প্রার্থনাও করলেন। দুটি ঘটনাই অন্যকে মর্যাদাদানের হৃদয়স্পর্শী দৃষ্টান্ত।

জগদ্ধাত্রীপূজায় জয়রামবাটী যাবেন

ভারতীপ্রাণামাতাজী। শ্রীশ্রীমা একবার তাঁকে বলেছিলেন, ''সরলা তুমি একবার জয়রামবাটীতে জগদ্ধাত্রীপূজা দেখতে যেয়ো'', তাই যাবেন। তখন ব্রহ্মচারিণী লীলা (পরে নির্মলপ্রাণাজী) মঠে নবাগতা। মা ঠিক করলেন তাঁকে নিয়ে যাবেন। মঠের অন্যান্য সকলের অসম্মতিতেই মা তাঁকে নিয়ে গেলেন—কেননা তাঁর ওপর তখনও তেমন কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার পড়েনি, ফলে মঠের দৈনিক কাজকর্মে বিশেষ পরিবর্তন হবে না। দুজনের জামাকাপড় এমনকী বিছানা পর্যন্ত মা একসঙ্গে বেঁধে নিলেন। পরে নির্মলপ্রাণাজী বলতেন, ''সঙ্কোচবশত আমার বসার আসনটা আর আমি নিতে পারিনি। জয়রামবাটীতে তাই ওঁরই কম্বলখানা পেতে নিয়ে একদিকে বসে আমাকে জপ করতে বলতেন।'' মা এমনই সহজ, সরল, নিরভিমান। জয়রামবাটীতে তরকারি কাটার পর পোকাবেগুনের কাটা টুকরোগুলো দুই বুড়ি কুড়িয়ে বাড়ি নিয়ে যেত। তারা কোনওদিন না এলে মা নিজে ওইগুলো কুড়িয়ে নিয়ে ওদের বাড়িতে গিয়ে দিয়ে আসতেন। যেখানে যে-কাজটি পড়ে থাকত নিজে এগিয়ে গিয়ে করে দিতেন।

শরৎ মহারাজের কাছে সেবা বলতে শুধু যে অন্নদান বা বস্ত্রদান বা রোগীর শুশ্রূষা তা নয়—আরও অনেক কিছু। বহু অসহায় মানুষের জাগতিক সব প্রয়োজন মেটানোর দায়ও ছিল তাঁর। তাঁর ভক্তবাৎসল্যের ইতি করা যায় না। কী না করতেন তিনি—শরিকি বিবাদ মেটানো, ছেলের চাকরি জোগাড় করে দেওয়া, কন্যার বিবাহের ব্যবস্থা, স্বামীহারার অন্নবস্ত্রের সংস্থান, আশ্রয়হীনের মাথা গোঁজার ব্যবস্থা। এমনকী বিধবার টাকা নিজ দায়িত্বে ব্যাঙ্কে জমা রেখে মাসিক সুদের হিসাব ঠিক রাখা, কোনও কোনও ভিখারির ভিক্ষালব্ধ অর্থের জমা-খরচের হিসাব রাখা—এভাবে সবার সব ভার বহন করতেন। এও দেখা গেছে, স্কুলের দারোয়ান দুরন্ত ছেলেটিকে দুপুরে মহারাজের কাছে রেখে গেছে—নিজের বিশ্রাম ভুলে তিনি তাকে সামলাচ্ছেন। প্রিয়জনকে হারিয়ে কেউ কাঁদতে কাঁদতে তাঁর কাছে ছুটে আসছে, তিনি সেই যন্ত্রণা আকর্ষণ করে নিচ্ছেন। যোগীন মার তিনটি নাবালক মাতৃহারা নাতিকে নিজের বিছানায় শোয়ানোর ব্যবস্থা করেছেন, পাছে তাদের ঠান্ডা লাগে তাই গরমকালেও ঘরের জানালা বন্ধ রেখেছেন। এভাবে বছরের পর বছর কাটিয়েছেন। সকলের জন্য শুধু দয়া, ক্ষমা, প্রেম, সহানুভূতি, সেবা আর কল্যাণকামনা। স্বামী ভূতেশানন্দ মহারাজ বলেছেন, ''তাঁকে দেখে আমাদের মনে হত—যেন মা-ই রূপান্তর নিয়ে বসে আছেন।'' নিজ ব্যয়ে নানারকম উপাদেয় খাবার আনিয়ে ভক্তমহিলাদের খাওয়াতেন, কারণ ''ওরা স্বামীপুত্রদের খাইয়ে নিজেরা ভাল করে খায় না।'' তাদের খাওয়া হলে ঘরের ইলেকট্রিক পাখা খুলে দিয়ে, ''তোমরা এখন একটু বিশ্রাম করো'' বলে নিচে চলে যেতেন। কারও সঙ্গে শিশুপুত্র থাকলে তাকে নিজের বিছানায় শোয়ার ব্যবস্থা করে দিতেন। প্রত্যেক একদশীর দিন ঠাকুর-মাকে লুচি-সন্দেশ নিবেদন করে সেই প্রসাদ নিয়ে বিধবা কন্যাগুলির জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতেন।

ভারতীপ্রাণামাতাজীও হয়ে উঠেছিলেন সকলের যথার্থ জননী। একসময়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজারিণী রাতে মাতাজীর ঘরের মেঝেতে শুতেন। বৃষ্টিতে সেই ঘরের দরজার তলা দিয়ে জল ঢুকত। এক ভোররাতে পূজারিণী উঠে দেখেন দরজার কাছে ন্যাতা-বালতি রাখা আছে। ব্যাপারটি হল—পূজারিণীকে ভোররাতে ঠাকুর তুলতে হবে বলে তাঁকে না জাগিয়ে, মা অতি সন্তর্পণে যাতে কন্যার ঘুম না ভেঙে যায় এভাবে বৃষ্টির জল মুছে মুছে বালতিতে রেখেছেন। ওই বয়সে নিচু হয়ে বারবার জল মুছতে তাঁর যে কতটা কষ্ট হয়েছে অনুমান

করা যায়, কিন্তু তার কোনও চিহ্নই সেই প্রশান্ত মুখে নেই। কখনও অন্য সেন্টার থেকে এসেছেন এক ব্রহ্মচারিণী, গঙ্গাস্নানের ইচ্ছা কিন্তু সঙ্গে কাপড় আনেননি—মা তাঁকে নিজের গঙ্গাস্নানের গেরুয়া কাপড় পরতে দিচ্ছেন। কখনও বা সাঁতার না জানা কাউকে নিজে হাত ধরে স্নান করাতেন। অনেক সময়ই মনে হত মাতাজী যেন গর্ভধারিণী মায়ের ভালবাসাকেও হার মানিয়ে দিচ্ছেন। 'অমুক আজ আমার চুল কেটে দেবে'—এই বলে অন্য সেন্টার থেকে এক ব্রহ্মচারিণীকে মঠে আনিয়েছেন; আসল উদ্দেশ্য, মাদ্রাজ থেকে আসা তার মায়ের হাতে তৈরি খাবার তাকে খাওয়ানো। সকলকে দেওয়ার মতো পরিমাণে নেই, তাই এই ব্যবস্থা। এমনই মাতৃত্ব। নিজে চা খেতেন না কিন্তু যে চা খায় তাকে ট্রেনেও ঠিক সময়মতো চা খাওয়াতে ব্যস্ত হতেন। আবার সূর্যগ্রহণে চূড়ামণিযোগে যে গঙ্গাস্নান করতে পারল না, তার নামে গঙ্গায় ডুব দিচ্ছেন। সঙ্ঘে যোগদানে ইচ্ছুক কত মেয়েকে যে তিনি কতভাবে সাহায্য করেছেন তা বলার নয়।

প্রতিবেশী ও ভক্ত ছেলেমেয়েদের দুঃখকষ্ট লাঘবের জন্যও মাতাজী সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন। বহু নির্যাতিতা মেয়েকে তিনি সহানুভূতি এবং অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছেন। একবার নিরুপায় এক ভদ্রঘরের বধূকে মঠে থাকবার ব্যবস্থা করে দেন। আর একবার পাগলিনী এক মহিলাকে বুকে জড়িয়ে ধরে শান্ত করেন। বাড়ির অত্যাচারে পালিয়ে আশ্রয় নেওয়া এক মহিলাকে মঠের বাগানে লুকিয়ে রাখেন। একটি দুঃস্থ মেয়ে মাঝে মাঝে আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়ে থাকতে বাধ্য হয়—মাতাজীর সেটি পছন্দ নয়। তাকে আটকাবার জন্য সকালে মঠেই একটি কাজের ব্যবস্থা করে দেন—দুঃস্থ ছেলেমেয়েদের পাঁউরুটি বিতরণ করার কাজ। আবার তার পেটের অসুখ হলে তাকে চিঁড়ের শরবত নিজে হাতে তৈরি করে সামনে বসে খাওয়ান। একবার এক ভক্তছেলে সিংহবাহিনী মায়ের মাটি চেয়ে পাঠিয়েছেন তাঁর কাছে। তাঁর কাছে তখন মাটি না থাকায় দুজন ভক্তমহিলাকে বলে ব্যবস্থা করলেন মাতাজী। পরদিন তাঁরা মাটি নিয়ে ভক্তের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এলেন। এরকম কত অজস্র ঘটনা। যারা অসহায়, দুঃখী, শোকার্ত তাদের জন্য মাতাজী যে কী করবেন ভেবে পেতেন না। এক মহিলার স্বামী ট্রেন দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। মাতাজীর স্নেহ তাঁর শোক টেনে নিল—অশান্ত মন শান্ত হল। 'আরতি বউ' বলে এক ভক্তমহিলার প্রতি মাতাজীর স্নেহ তো কিংবদন্তি হয়ে আছে। সেই অবুঝ, দুঃখী মহিলার যত আবদার 'মা'র কাছে। সেবিকাদের প্রতি মার নির্দেশ ছিল, সে যখনই আসবে তখনই তাকে প্রসাদ দিতে হবে। মঠে এসে সন্ধ্যারতি দেখে, মায়ের সঙ্গে কথা বলে সে যখন বাড়ি ফিরে যাবে, মায়ের নির্দেশে তাঁর সেবিকা তাকে মঠের গেট পর্যন্ত পৌঁছে দেবেন আর গেট পাহারা দেবেন; কারণ গেটের দারোয়ান যাবে তাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে এবং মা স্বয়ং পুরনো মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে গেটে দাঁড়িয়ে থাকা তাঁর সেবিকাকে পাহারা দেবেন। সে এক মজার ব্যাপার। এরকম ব্যবস্থা বহুদিন চলেছে। শুধু ধর্মজীবনের বাধা দূর করাই নয়, সন্তানের সব দুঃখকষ্ট দূর করে মুখে হাসি ফোটানোও যেন ভারতীপ্রাণামাতাজীর কাজ ছিল। একজন ভদ্রমহিলার হাঁপানির কষ্ট। মাতাজী তাকে বলতেন, ''তুমি একা এসো না, কাউকে সঙ্গে নিয়ে আসবে। তাড়াতাড়ি বাড়ি যাবে।" সে একটা টোটকা ওষুধে সেরে গেলে মাতাজীর কী আনন্দ! বারবার বলতেন, ''আর কোনও কষ্ট নেই তো? খুব ভাল হল।" শরৎ মহারাজের মতো পারিবারিক বিবাদও তিনি কম মেটাননি। এক বৃদ্ধা তাঁর স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে এসে মার কাছে নালিশ করছেন। এদিকে তাঁর স্বামীও এসে হাজির। মা হাসিমুখে সব শুনছেন।

বলছেন, ''সত্যিই তো খুব অন্যায়। তবে ভদ্রলোক যখন এসেইছেন তখন তোমার উচিত ছিল তাঁর সঙ্গে আসা। যাওয়ার সময় একসঙ্গে রিক্সায় যেয়ো, কেমন?''

স্বামী নির্লেপানন্দ শরৎ মহারাজ সম্পর্কে লিখেছেন, ''সব মানুষকে, ছেলে বুড়ো সবাইকে—সকলের সম্ভাবনীয়তাকে শ্রদ্ধা করিতে যাহা দেখিয়াছি তাহা এ-জগতে বিরল। অতি ছোট ক্ষুদ্র তুচ্ছকে সমাদরে কাছে বসিয়ে তার আবোল তাবোল সব কথা শুনেছেন। স্ফূর্তি ফষ্টিনষ্টি করছেন, 'তাই নাকি', বলে উচ্চরোলে হেসে কুটিকুটি।'' এই দেখার পুরোটাই যেন ভারতীপ্রাণা-মাতাজীর সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া যায়। সাধারণ, বিশিষ্ট, অভিজাত—সকলের প্রতি অদ্ভুত সমদৃষ্টি তাঁর। তাঁর স্নেহবলয়ের মধ্যে একবার যে ঢুকে পড়েছে সে আর তা থেকে বের হতে পারেনি। ত্রিচুরের এক অসুস্থ বৃদ্ধ দম্পতি মঠে এসে তাঁকে প্রণাম করতে পারবেন না জেনে তিনি নিজে অশক্ত শরীরে তাদের বাড়ি যান। ভক্তরা তাঁর জন্য কোনও খাবার আনলে তা যেমনই হোক মুখে দেবেনই। সেবিকারা অনুযোগ করলে বলতেন, ''একটু খাব বলে এরা কত আশা করে আনে—তা কষ্ট একটু হলই বা।'' দুঃখী এক মেয়ের খুব সাধ মার জন্য কিছু আনে—মা বলছেন, ''ছোট ছোট টক টক লজেন্স পাওয়া যায়, সেই আনবে।'' মাতাজীর দূরদৃষ্টি, স্নেহচ্ছায়া, অভয়বাণী যে কত জীবনের অন্ধকার দূর করে আলোর পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে, জীবনকে নূতন করে দেখতে শিখিয়েছে—আনন্দে ভরে দিয়েছে, তার সীমাসংখ্যা নেই।

আরও একটি অদ্ভুত মিল ছিল সারদানন্দজীর সঙ্গে মাতাজীর। সবাই ভাবত মহারাজ তাকেই সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন; মাতাজীর ক্ষেত্রেও সকলের ঠিক একইরকম অনুভূতি হত। সবাই ভাবত মার স্নেহ অন্যদের চেয়ে তার উপরেই বেশি।

শরৎ মহারাজের মতো ভারতীপ্রাণামাতাজীর চরিত্রেও একইসঙ্গে সাধকোচিত গাম্ভীর্য এবং আনন্দরসের মিশ্রণ দেখা যেত। শরৎ মহারাজকে একবার স্বামী পূর্ণানন্দ বলছেন, ''কই কিছুই তো হল না!'' শরৎ মহারাজ তক্ষুনি বলে উঠলেন, ''কী হবে বাবা, চতুর্ভুজ হবে নাকি? তাহলে শোবে কী করে?'' অভিনয় ও কৌতুক করার একটি অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল ভারতীপ্রাণামাতাজীর। ভগিনী নিবেদিতা, গোলাপ মা, যোগীন মা প্রমুখের আচরণ হুবহু অভিনয় করে দেখাতেন। একদিন যোগীন মার মতো উঁচু করে শাড়ি পরে দেখালেন কীভাবে রাতে শুতে যাওয়ার আগে যোগীন মা সব ঠাকুর-দেবতার ছবি প্রণাম করতেন। তাঁর মজার অভিনয় দেখে হাসির রোল উঠল। একবার পূজারিণী দুপুরবেলা শয়ন দেওয়ার আগে ঠাকুর ও মায়ের মালা খুলে রেখে বিকেলে আবার মালা পরাবার সময় মায়ের মালা ঠাকুরকে ও ঠাকুরের মালা মাকে পরিয়ে ফেলেন। এতে অনেকেই সেবাপরাধ মনে করে চিন্তিত হন। ব্যাপারটি মাতাজীকে জানানো হলে তিনি সকৌতুকে বলে ওঠেন, ''এই নিয়ে এত ভাবছ কেন গো? ওঁরা কি মালা বদল করেননি? জানবে ওঁদের মধ্যে কোনও ভেদ নেই।''

মহেন্দ্রনাথ দত্তের বিবরণে জানা যায়, হাস্যরস পরিবেশনের সময় শরৎ মহারাজের শরীরী ভাষাও বিশেষ ভূমিকা নিত। নিজের অভিজ্ঞতাকে রসালো করে উপস্থাপনা করতে শরৎ মহারাজের জুড়ি মেলা ভার। ছোট হাসির গল্প মুখে মুখে বানিয়ে বলাতেও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। মহেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে শরৎ মহারাজ একদিন গঙ্গাস্নান সেরে ফিরছেন। ফেরার পথে একটি ষাঁড়কে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মহেন্দ্রনাথ অনুমানে বলেন, ষাঁড়টি যে-বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে, ওই বাড়িরই হবে। শরৎ মহারাজ সরাসরি তাঁকে কিছু না বলে একটা মজার গল্প বলেন। এক মাতাল তার গুলিখোর বন্ধুর

সঙ্গে রাস্তায় যেতে যেতে এক মিষ্টির দোকান থেকে টাকা দিয়ে কিছু খাবার কেনে। সেদিন দোকানির কাছে এত টাকার ভাঙানি না থাকায় সে বাকি পয়সা ফেরত দিতে পারেনি। পরে তার কাছ থেকে পয়সা ফেরত নেওয়ার কথা ঠিক করে দুই বন্ধু ফিরে যায়। দোকান চিনে রাখার জন্য তারা মিষ্টির দোকানের সামনে বসে থাকা একটি বড় সাদা ষাঁড়কে চিহ্নিত করল। পরদিন ওই ষাঁড়কে পাওয়া গেল এক দর্জির দোকানের সামনে। দুই বন্ধু বাকি টাকা আদায় করতে গিয়ে হাজির হল দর্জির কাছে। দর্জি আপত্তি জানালে তাকে দুই বন্ধু বলল, ''কি বাবা, দশ গণ্ডা পয়সা ফাঁকি দেবার জন্যে একেবারে ভোল ফিরিয়ে বসে আছ? কাল ছিলে মিষ্টির দোকানী—হালুইকর, আর আজ হলে দর্জি! আর বাবা, রাতারাতি দাড়ি গজিয়ে ফেললে। এখনও তার সাক্ষী সাদা ষাঁড় শুয়ে রয়েছে। গুলি খাই বলে বাবা মনে করো না, আমার ভুল হয়েছে।''

গল্প বলার সময় শুধু মুখের কথা দিয়েই নয়, নাটকীয়ভাবে চোখমুখের নানা ভঙ্গিতে, হাতের বিভিন্ন কৌশলেও মহারাজ অন্যের মুখের হাসি ফুটিয়ে তুলতেন। অথবা সেই গল্পটি বলা—পূর্ববঙ্গ থেকে একটি লোক কলকাতা শহর দেখে গ্রামে ফিরে যাওয়ার পর গ্রামের একজন তাকে জিজ্ঞাসা করছে, রানি রাসমণিকে সে দেখেছে কি না। সে কলকাতা-ফেরত মাতব্বর, তার অজানা কিছু নেই। সে বলল, 'হ, দেখ্‌ছি'। জিজ্ঞাসু প্রশ্ন করল—'কেমন দেখতে?' মাতব্বর বললে, 'একটা পিড়া পাত্‌ছে, আর একটা পিড়া ঠ্যাস মার্‌ছে। একদিকে চিনির ধামা রাখ্‌ছে। আর একদিকে তেলের কেঁড়ে রাখছে। চিনি থাবা থাবা খাচ্ছে, আর তেল পলা পলা খাচ্ছে; আর এই মোচে তাও লাগাচ্ছে।' '' গল্পকথক সারদানন্দজীর চোখমুখের ভঙ্গি, ঠোঁটে হাত দিয়ে গোঁফে চাড়া দেওয়া ইত্যাদি দেখে শ্রোতারা হেসে অস্থির হত।

ভারতীপ্রাণামাতাজীরও গল্পের ভাণ্ডার ছিল অফুরন্ত। গল্প বলার সময় তাঁর মুখভঙ্গি, শরীরী ভাষা, অপূর্ব অনুকরণ যাঁরা দেখেছেন আজও ভুলতে পারেননি। মনে হয় এইসব অনাবিল হাসি-আনন্দের মধ্য দিয়ে তাঁরা যেন জগতের দুঃখতাপিত মানুষদের সামনে ওই আনন্দধামের, অমৃতলোকের সুস্পষ্ট একটি ছবি তুলে ধরতে চাইতেন—যেখানে কেবলই আনন্দ—দিবানিশি পূর্ণশশী আনন্দে বিরাজ করে। এই আনন্দের অমৃতের সন্তানরা জানতেন রস কীভাবে পরিবেশন করতে হয়।

ভারতীপ্রাণামাতাজীর মাতৃসুলভ স্নেহদৃষ্টি, অহেতুক লোককল্যাণেচ্ছা, ধৈর্য, স্থৈর্য ইত্যাদি দেখে তাঁকে শরৎ মহারাজের যথার্থ মানসকন্যা বলেই আমাদের মনে হয়। ✠

সহায়ক গ্রন্থ

১। সম্পাদিকা : প্রব্রাজিকা নির্ভয়প্রাণা, *ভারতীপ্রাণা স্মৃতিকথা* (শ্রীসারদা মঠ : কলকাতা, ১৪১৩)
২। সঙ্কলক ও সম্পাদক : স্বামী চৈতন্যানন্দ, স্বামী সারদানন্দ : এক অনন্য জীবন (উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা, ২০১৮)

১৪ ও ১৫ জানুয়ারি ২০২০ শ্রীসারদা মঠ প্রাঙ্গণে বিবেকমেলা অনুষ্ঠিত হবে।

নিবোধত কার্যালয়ের ছুটির বিজ্ঞপ্তি

১৭ জানুয়ারি ২০২০ স্বামীজীর জন্মতিথি উপলক্ষ্যে কার্যালয় দুপুরবেলা বন্ধ থাকবে।
৩০ জানুয়ারি ২০২০ সরস্বতীপূজা উপলক্ষ্যে কার্যালয় সারাদিন বন্ধ থাকবে।
৩১ জানুয়ারি ২০২০ সরস্বতীপূজার পরদিন কার্যালয় দুপুরবেলা বন্ধ থাকবে।
২১ ফেব্রুয়ারি ২০২০ শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে কার্যালয় সারাদিন বন্ধ থাকবে।